The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক : প্রসঙ্গ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[Liberation war memorial: Context Rajshahi University]

Dr. Md. Arifur Rahman
Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 22 May 2025
Received in revised: 05 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Liberation War, Liberation War Memorial, Rajshahi University.

ABSTRACT

From the establishment of Rajshahi University in 1953, The University played a vital role in all the democratic movement against Pakistan Government. The role of Rajshahi University in the mass-upsurge of 1969 was remarkable. The mass-upsurge of 1969 become very extreme as a result of murder of Rajshahi University teacher and formerly Proctor Dr. Shamsuzzoha. Pakistani military set their camp at Shamsuzzoha Hall and Zubery Bhaban of RU in 1971. Teachers, Students and other employees of R.U became martyr in the liberation war. Rajshahi University constructs many reminiscents of 1971 to protect the memory of liberation war. In this article I endeavor to present the role of R.U. in the liberation war through the reminiscents and monument which is constructed in the campus.

ভূমিকা

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের প্রবাহমান ধারায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানকার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭-৭১ সময়কালে উত্তর জনপদে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লড়াইয়ে অগ্রপথিক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি কাজ করেছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছিল দুর্বার প্রতিরোধ। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-ছাত্র এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী আত্মদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মারক। আলোচ্য প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মারক ও স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তুলে ধরা হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদন করা হয়েছে। যথা:

ক. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা অনুসন্ধান ;

খ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক পরিচিতি ; এবং

গ. মুক্তিযুদ্ধের এ সকল স্মারকের স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ।

যৌক্তিকতা

জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের ইতিহাসচর্চা সমকালীন ইতিহাসশাস্ত্রের একটি শক্তিশালী ধারা। একটি দেশ বা জাতির সামগ্রিক ইতিহাস রচনার জন্য স্থানীয় ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাসচর্চার ফলে জাতীয় ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে। সেই হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করার যৌক্তিকতা রয়েছে। এতে করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি।

প্রয়োজনীয়তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর আন্দোলন-সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই এখানকার ছাত্র-শিক্ষকরা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শামিল হন। পরবর্তীতে তাঁরা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এখানকার ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এছাড়া আমার জানা মতে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক নিয়ে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলে গবেষক, সাধারণ পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদন করার জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- ১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ২. পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Emperical Method)। প্রবন্ধটিতে মূলত প্রাথমিক (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রিপোর্ট) ও সহায়ক (প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও হল স্মরণিকা) উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সহায়ক উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অধ্যয়নপূর্বক বিশ্লেষণ করে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথার্থ সিদ্ধান্তটি গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলে। রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজশাহীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করা হয়।[১] কিন্তু স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী।[২] রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পরপরই ড. জুবেরী স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এসময় বিশিষ্ট আইনজীবী মাদার বখ্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সালে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এমদাদ আলীকে সভাপতি এবং মাদার বখ্শ ও ড. জুবেরীকে যুগ্ম-সম্পাদক করে সর্বমোট ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়।[৩] নুরুল আমিন (পূব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী) সরকার ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করেন।[৪] ১৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চ বিলটি The Rajshahi University Act, 1953 (The East Bengal Act XV of 1953) নামে ব্যবস্থাপক পরিষদে পাস করা হয়।[৫] ৬ই জুন গভর্নর এই বিলে সম্মতি দেন। ১৬ই জুন ১৯৫৩ তারিখে এ্যাক্টটি ঢাকা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালের ৬ই জুলাই রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. জুবেরীকে প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়।[৬] ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পরের বছর যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা ৫৪'এর যুক্তফ্রন্ট জোয়ারে সেভাবে অংশ নিতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে দলীয় বা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখা হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে কলা ভবনের (বর্তমানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একাডেমিক ভবন) সামনে খণ্ড-খণ্ড মিছিল করে।[৭] গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা দিবস পালন করে। সে সময় ছাত্রদের এই আন্দোলনে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনও বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ্ কলা ভবনের সামনে ১৯৬৩ সালে প্রথমবারের মতো ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।[৮] সে সময় সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে।

১৯৬৪ সালের ১৬ই মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাবর্তন বর্জনের আহ্বান জানান। সমাবর্তনস্থলে মোনায়েম খান উপস্থিত হলেও ছাত্রদের বাধার মুখে সুষ্ঠুভাবে তা শেষ করা যায়নি। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ঘোষণার পর পূর্ববাংলায় স্বাধিকার আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে। ৬ দফা আন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে উত্তর জনপদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছে। ৬ দফা দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়।[৯] ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সমগ্র পূর্ববাংলায় আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান চরম আকার ধারণ করে। এসময় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। ১৯৬৯ সালের ১৬ই

ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে। এসময় পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্রদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ড. জোহা অবাঙালি জেলা প্রশাসককে তিরস্কার করেন।[১০] ১৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) রাজশাহীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রায় অকারণে এবং বিদ্বেষমূলকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।[১১] এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক হতাহত হন। ড. জোহাকে বর্বরোচিত হত্যার খবর ঢাকায় পৌছামাত্র রাজধানীতে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৮ই তারিখ রাতেই ঢাকা শহরে হাজার হাজার লোক সান্ধ্য আইনের পরোয়া না করে রাস্তায় বের হয়ে আসে। ঢাকা ছাড়াও ঐ রাতে দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ড. জোহার হত্যার প্রতিবাদে পরদিন সারাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে ২০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে নেয়। ড. জোহার হত্যার মধ্য দিয়ে '৬৯ এর চলমান আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খানের দীর্ঘ ১০ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত ঘটনাবলি

মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ ছিল সর্বাত্মক। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন মার্চ মাসের গোড়ার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এক সভায় বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১২]তবে ড. সিরাজুল আরেফিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাধীনতার কোন লিখিত কপি রাখা হয়নি। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের সেনানিবাস স্থাপন করেছিল। সে সময় স্বাধীনতা ঘোষণা বিষয়ক ঐ সিদ্ধান্তের কপির জন্য সভাপতি ড. সিরাজুল আরেফিনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।[১৩] এসময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্রসমাজ ১-৩ মার্চ (১৯৭১) ক্যাম্পাসে ও শহরে মিছিল বের করেছিল।[১৪] ৩রা মার্চ মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ফলশ্রুতিতে পাকবাহিনী সান্ধ্য আইন জারি করেছিল এবং ১২ ঘণ্টার সময় দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হল ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।[১৫] ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন।[১৬] বহু শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের (অস্থায়ী বা মুজিবনগর সরকার) আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে অসহযোগিতা করে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন এবং সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।[১৭] বৈরি পরিস্থিতিতেও ক্যাম্পাসের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা ক্যাম্পাসে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক, ৫ জন সহায়ক কর্মচারী, ১০ জন সাধারণ কর্মচারী ও ৯ জন ছাত্র শহীদ হন।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্ররাও নিজ নিজ এলাকা থেকে অংশ নিয়েছিলো । এক সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩২ শতাংশ ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এ হার ছিল সর্বোচ্চ।[১৯] মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ৯০৯ জন ছাত্রের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে অংশগ্রহণকারী ৯০৯ জন ছাত্রের মধ্যে ১০১ জন ছাত্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল।[২০] এদের মধ্যে ৮৫ জন ছিল সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, ৫ জন রিপোটার্স, ১ জন স্পাই ও বাকীরা অন্যান্যভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক

মহান মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশের ন্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও গড়ে উঠেছিল প্রতিরোধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকহানাদার বাহিনী তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার ও তাদের দোসরদের কর্তৃক বেশ কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিহত হন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ধারণ করা এবং শহীদ ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মারক গড়ে উঠেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

শহীদ মিনার

১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে আমতলায় অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে প্রথমবারের মতো ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।[২১] ১৯৬৪-৬৫ সময়কালে রাকসুর রাজ্জাক-বায়েজিদ পরিষদ নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সার্বিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনার।[২২] কিন্তু ১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনী এ শহীদ মিনার বিস্ফোরকের মাধ্যমে গুঁড়িয়ে দেয়।

প্রথম শহীদ মিনার (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ একাডেমিক ভবনের সামনে অবস্থিত)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদ মিনার দেশের অন্যান্য শহীদ মিনারের গড়নের দিক থেকে আলাদা। ১৯৭২ সালের ৯ই মে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান স্থানে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[২৩] শহীদ মিনারটি কৃত্রিমভাবে তৈরি মাটির টিলার উপর অবস্থিত। এই শহীদ মিনারে রয়েছে চারটি বাহু যা উলম্বভাবে উঠে গেছে উপরের দিকে। বাহু চারটি উপরের দিকে বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ। এখানে চারটি বাহু দ্বারা ১৯৭২ সালের সংবিধানের চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুউচ্চ এ শহীদ মিনার বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক। মিনারের পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘ একটি ম্যুরাল চিত্র। 'অক্ষয়বট' শীর্ষক ম্যুরালটি নানা বর্ণের পোড়া ইট, পাথর ইত্যাদি নানা অক্ষয় মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে। এ চিত্রটিতে রূপ দেয়া হয়েছে এক স্নেহময়ী মা ও তাঁর বীর সন্তানদের।[২৪] ম্যুরালটিতে সূর্যের উপস্থিতিতে শহীদ সন্তানদের বীরত্ব ও তেজস্বিতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ম্যুরালটি নির্মাণ করেন শিল্পী মুর্তজা বশীর।[২৫]বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রথম আন্দোলন ছিল ভাষা আন্দোলন। আর শহীদ মিনার ছিল তার প্রথম স্মারক।

শহীদ মিনার

শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধে অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা গড়ে উঠে। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ২রা জানুয়ারি উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৬] ১৯৮৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ। ১৯৯০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করেন শহীদ শিক্ষকপত্নী বেগম ওয়াহিদা রহমান, বেগম মাসতুরা খানম এবং শ্রীমতি চম্পা সম্মাদার।[২৭] চমৎকার স্থাপত্যে নৈপুণ্যে চার কক্ষ বিশিষ্ট এই সংগ্রশালা। শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ সংগ্রহশালা। স্থানীয় সংগ্রহশালা হিসেবে এটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, দলিল-দস্তাবেজ, চিত্রমালা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়েছে।[২৮] ৫২' এর ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে পরবর্তী পর্যায়সমূহ। ৬৬' এর ছয় দফা থেকে ৭০' এর নির্বাচন এবং ৭১' এর মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত অসংখ্য দুলর্ভ চিত্র এখানে রয়েছে।[২৯]

শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা

সাবাশ বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই 'সাবাশ বাংলাদেশ' স্থাপত্যটি চোখে পড়ে। প্রধান ফটকে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের এ স্তম্ভটি স্মরণ করিয়ে দিবে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সাবাশ বাংলাদেশ' কবিতা অবলম্বনে নামকরণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'সাবাশ বাংলাদেশ'।[৩০] শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এ ভাস্কর্যটি তৈরি করেন। ১৯৯২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এটির উদ্বোধন করেন।[৩১]

সাবা বাংলাদেশ

মুল ভাস্কর্যে দু'জন যুবককে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার একজন গ্রামের কৃষক সমাজের এবং অন্যজন শহুরে যুবকের প্রতিনিধিত্ব করছে। সম্পূর্ণ ভাস্কর্যটির দু'পাশে রয়েছে সাদা প্যানেল। এখানে শিল্পী, ছাত্র, যুবক, মা-বোন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এ স্মারক ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ তিন শিক্ষক হবিবুর রহমান, মীর আব্দুল কাইয়ুম ও সুখরঞ্জন সমাদ্দার স্মরণে ২০১৫ সালে এই স্মৃতিফলক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নির্মাণ করা হয়। বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলকে শহীদ তিনজন শিক্ষকের রিলিফ ভাস্কর্য রয়েছে। উক্ত স্মৃতিফলকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রিলিফ ভাস্কর্যও রয়েছে। স্মৃতিফলকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক

বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলকে পাকহানাদাররা ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে। বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মানুষকে এখানে ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল খালেক এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। পরবর্তী উপাচার্য প্রফেসর এম. সাইদুর রহমান খান ১৯৯৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বধ্যভূমির কাজ শুরু করেন। সমতল ভূমি হতে উঁচু সিমেন্টের বেদির উপর ৪২ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিস্তম্ভটি শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার অন্তর্ভুক্ত।

বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ

শহীদ শামসুজ্জোহা হল

শহীদ শামসুজ্জোহা হল ১৯৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩২] ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্ব পালনকালে ড. শামসুজ্জোহা ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে পাকিস্তান সেনা সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। ড. শামসুজ্জোহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১ সালে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী। ড. জোহার স্মরণে অত্র হলের নামকরণ করা হয় শহীদ শামসুজ্জোহা হল।[৩৩]

শহীদ শামসুজ্জোহা হল

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ হল রূপান্তরিত হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতন কেন্দ্রে। শত শত বাঙালি নারী-পুরুষকে এ হলে বন্দি করে তাদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করে মৃতদেহগুলোকে হল সংলগ্ন বধ্যভূমিতে নিক্ষেপ করা হতো। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭২ সালের ৬ই এপ্রিল নতুন করে এ হল আবার চালু করা হয়। পরবর্তীতে জোহা হলের প্রধান ফটকে ২০১২ সালে ড. শামসুজ্জোহার স্মৃতির স্মরণে তাঁর প্রতিকৃতি 'স্ফুলিঙ্গ' নির্মাণ করা হয়।

শহীদ শামসুজ্জোহার ভাস্কর্য

জোহা চত্বর ও স্মৃতিফলক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্ব পালনকালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তারিখে ড. জোহা ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে বলেন, "আহত ছাত্রদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে আজ আমি উজ্জীবিত, কোন ছাত্রের গায়ে গুলি লাগার আগে সে গুলি আমার বুকে লাগবে।" ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে (১৯৬৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে তিনি পাকহানাদারদের গুলিতে নিহত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে রাজশাহী-নাটোর রোডের পাশে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে ড. জোহাকে সমাহিত করা হয় এবং স্থানটিকে জোহা চত্বর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জোহা চত্বর

প্রধান ফটকের সামনে ড. জোহা যেখানে গুলিবিদ্ধ হন সেখানে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়।

ড. জোহা স্মৃতিফলক

শহীদ হবিবুর রহমান হল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক হবিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল পাকসেনারা তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।[৩৪] স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে এই মহান শহীদের নামে ১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হলের নামকরণ করা হয়।

শহীদ হবিবুর রহমান হল

অধ্যাপক হবিবুর রহমান থাকতেন ক্যাম্পাসের প-১৯/বি নম্বর বাসায়। পাকসেনাদের নির্যাতনের প্রতিবাদ হিসেবে তিনি বাসায় কালো পতাকা উড়িয়ে দেন। পাকসেনারা জোর করে কালো পতাকা নামিয়ে ফেলে এবং তাঁরা বাসা ভাংচুর করে। উত্তাল মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতা করেন। শহীদ হবিবুর রহমানের স্মৃতি ধরে রাখতে ২০১১ সালে হল গেটে 'বিদ্যার্ঘ' নামে একটি মনুমেন্ট তৈরি করা হয়।[৩৫] ১৯৯৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শহীদ হবিবুর রহমানকে একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করেছে।[৩৬]

বিদ্যার্ঘ

শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ুম ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরি

শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ুম ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মীর আব্দুল কাইয়ুমের নামে এই ডরমিটরিটি নামকরণ করা হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে নভেম্বর বাসা থেকে ডেকে নিয়ে পাকসেনারা তাকে হত্যা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের এই শহীদ বুদ্ধিজীবীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ডরমিটরিটি তাঁর নামে নামকরণ করে।

শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ুম ডরমিটরি

শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ২০১৪ সালে সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক সুখরঞ্জন সমাদ্দারের নামে এটির নামকরণ করা হয়।

শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দারের সমাধি (কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে অবস্থিত)

শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সুখরঞ্জন সমাদ্দার ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় তিনি ইপিআর বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাসভবনে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন।[৩৭] ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৪ই নভেম্বর তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং কাজলা গেটের অদূরে তাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সমাধিস্থ করা হয়।

শহীদ মোহাম্মদ আলী মিলনায়তন

১৯৭১ সালে যখন সারাদেশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে ঠিক সেই সময় মোহাম্মদ আলী অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন।[৩৮] তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের ছাত্র ছিলেন। সে সময় দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী শহরে তিনি শহীদ হন। পরবর্তীতে তাঁকে শেরে বাংলা হলের অভ্যন্তরে সমাহিত করা হয়।

শহীদ মোহাম্মদ আলীর কবর (শেরে বাংলা হলের অভ্যন্তরে অবস্থিত।)

মোহাম্মদ আলীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ২০১০ সালে শেরে বাংলা হল প্রশাসন অত্র হলের মিলনায়তনটিকে তাঁর নামে নামকরণ করে।[৩৯]

শহীদ মোহাম্মদ আলী মিলনায়তন (শেরে বাংলা ফজলুল হক হল)

উপসংহার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তান আমলের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণমানুষের দাবিকে অত্যন্ত যৌক্তিক ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অন্যতম এ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠেও দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর গড়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে সাবাশ বাংলাদেশ, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধসহ মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মারক। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও শহীদদের নামে বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মারক ও স্থাপত্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামান্য ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

আলোকচিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে শহীদদের নামের তালিকা

শহীদ সাগর (জোহা হলের পূর্বদিকে অবস্থিত এই পুকুর ১৯৭১ সালে বহু শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে)

জুবেরী ভবন (মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে)

শহীদ স্মৃতি ম্যুরাল (শহীদ মিনার কমপ্লেক্সে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল)

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই (শহীদ মিনার কমপ্লেক্সে অবস্থিত ভাষা আন্দোলনের চিত্র)

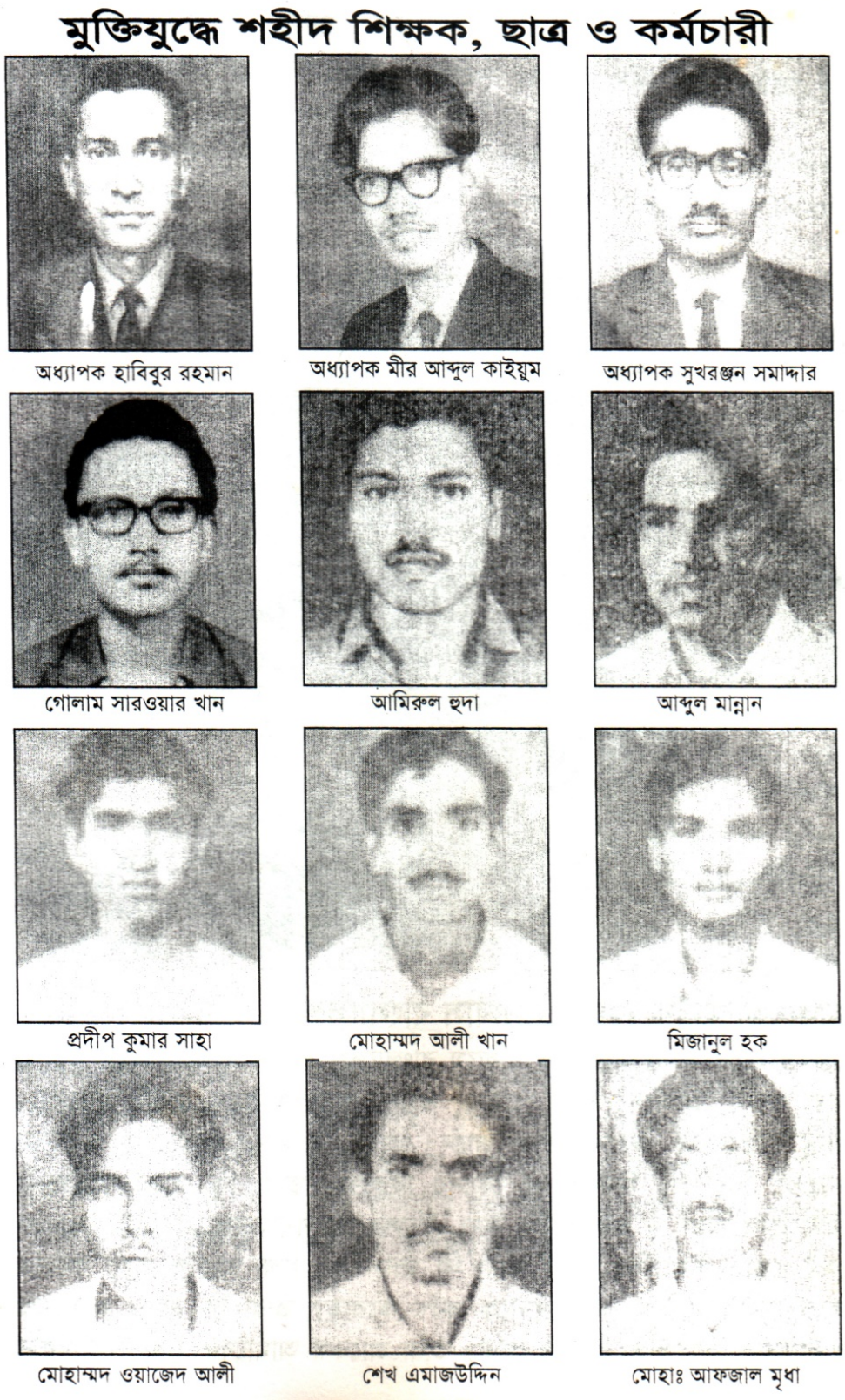

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শহীদ
(উৎস: বায়েজিদ আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস)

তথ্যনির্দেশ

[১] S. A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi: It's Past and Present* (Rajshahi University: Institute of Bangladesh Studies, 1983), p. 459.
[২] বায়েজিদ আহমেদ, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস* (রাজশাহী: শেকড় সন্ধানী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ২১।
[৩] মোঃ আবুল কালাম, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ও ১৯৫৩ ও ১৯৭৩: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', M.A. Bari and M. Fayek Uzzaman (ed.), *History Society Culture: ABM Hussain Festchrift*. (Dhaka: Khan Brother's & Co., 2009), p. 464.
[৪] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৫।
[৫] Assembly Precedings Official Report EBLA Thenth Session. Vol. X, No. 2, pp. 241-296.
[৬] বাংলাপিডিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।
[৭] আবু সাইয়িদ, *ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ- খণ্ড চিত্র* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২), পৃ. ৩৯৮।
[৮] *ঐ*, পৃ. ৪০৩।
[৯] Salauddin Ahmed, *Bangladesh Past and Present* (Dhaka: Pragon Publishers, 2004), p. 161.
[১০] আব্দুল খালেক, 'ড. জোহা এলেন লাশ হয়ে', মনসুর আহমেদ (সম্পা.), *উনসত্তরের শহীদ ডক্টর শামসুজ্জোহা* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২৮।
[১১] আব্দুল হালিম, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১৭৪।
[১২] নাজিম মাহমুদ, *যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি ৭১* (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ১৪।
[১৩] মোঃ আবুল কালাম, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস (১৯৫৩-২০০৩)*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ২৬১।
[১৪] মোহাম্মদ মোনায়েম চৌধুরী ও মোঃ আবু সাঈদ, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির গতি প্রকৃতি', মোহাম্মদ নাজিমুল হক (সম্পা.), *ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরণ* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ৩০ জুন, ২০১৭), পৃ. ২১৩।
[১৫] *ঐ*।
[১৬] মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস (১৯৫৩-২০০৩)*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১।
[১৭] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৮।
[১৮] *বাংলাপিডিয়া*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭; শহীদদের নামের তালিকা পরিশিষ্টে ছবিতে দেখুন।
[১৯] মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী* (ঢাকা), পৃ. ৬৮।
[২০] মোহাম্মদ মোনায়েম চৌধুরী ও মোঃ আবু সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩।
[২১] আবু সাইয়িদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৩।
[২২] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।
[২৩] *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আর্কাইভস ও ক্যালেন্ডার থেকে প্রাপ্ত তথ্য*।
[২৪] 6 June, *The Campus Today* (অনলাইন পত্রিকা)
[২৫] *Ibid*.
[২৬] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯।
[২৭] *শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য*।
[২৮] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯।
[২৯] *ঐ*।
[৩০] 9 June,*The Campus Today* (অনলাইন পত্রিকা)।
[৩১] *ঐ*।
[৩২] *শহীদ শামসুজ্জোহা হল থেকে প্রাপ্ত তথ্য*।
[৩৩] আনন্দ কুমার সাহা (সম্পা.), *হল পরিচিতি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০), পৃ. ২৫।
[৩৪] মো. মাহবুবর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী শহর', মো. মাহবুবর রহমান (সম্পা.), *রাজশাহী মহানগর: অতীত ও বর্তমান*, প্রথম খণ্ড (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: আইবিএস, ২০১২), পৃ. ৪৫৮।
[৩৫] আনন্দ কুমার সাহা (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯।
[৩৬] *ঐ*।
[৩৭] মো. মাহবুবর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী শহর', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৯।
[৩৮] *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হল থেকে প্রাপ্ত তথ্য*।
[৩৯] *ঐ* ।